بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মোতাবেক ২৮ তবলীগ, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

আজ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে, তার নাম হল হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) কুরাইশদের বনু 'আব্দুদ্ দ্বার' গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্। এছাড়া তার ডাকনাম আবু মুহাম্মদও বলা হয়ে থাকে। হযরত মুসআব (রা.)'র পিতার নাম ছিল উমায়ের বিন হাশেম এবং তার মায়ের নাম ছিল খানাস বা হানাস বিনতে মালেক, যিনি মক্কার একজন বিত্তবান নারী ছিলেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র পিতামাতা তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতো। তার মাতা তাকে অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে লালনপালন করেছে। সে তাকে সর্বোত্তম পোশাক এবং উন্নত মানের বস্ত্র পরিধান করাতো। হযরত মুসআব (রা.) মক্কার উন্নত মানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, আর 'হাযার মওত' অঞ্চলে প্রস্তুতকৃত হাযরামী জুতা, যা ধনীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তা সেখান থেকে আনিয়ে পরিধান করতেন। 'হাযার মওত' অঞ্চল হল 'আদান' এর পূর্ব দিকে সমুদ্রের নিকটবর্তী একটি বিস্তীর্ণ এলাকা। যাহোক, উত্তম পোশাক, উন্নত মানের সুগন্ধি, এমনকি জুতাও তিনি বাহির থেকে আনাতেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র স্ত্রীর নাম ছিল হামনাহ্ বিনতে জাহাশ, যিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ এর বোন ছিলেন। হামনাহ্ বিনতে জাহাশের গর্ভে এক কন্যা যয়নবের জন্ম হয়। মহানবী (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে স্মরণ করে বলতেন, আমি মুসআবের চেয়ে অধিক সুদর্শন ও সুন্দর এবং প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে লালিতপালিত অন্য কাউকে দেখি নি। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৫-৮৬, মুসআব বিন উমায়ের (রা.) বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭৫, মুসআব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, (শাহ্ মঈন উদ্দীন আহমদ নদভী রচিত সীরাতুস্ সাহাবাহ্, ২য় খণ্ড, মুহাজিরীন প্রথম অংশ, পৃ: ২৭০, ২৭৫, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ ইশায়াত থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত), (উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭১, হামনাহ্ বিনতে জাহাশ, বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত), (মু'জিমুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৭, বৈরুতের দারুল এহইয়াতুত্ তারাসুল আরবী থেকে প্রকাশিত)**

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) মহান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। মহানবী (সা.) যখন দ্বারে আরকামে তবলীগ করতেন তখন তিনি (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু নিজের 'মা' এবং জাতির বিরোধিতার আশঙ্কায় তা গোপন রাখেন। হযরত মুসআব (রা.) গোপনে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হতে থাকেন। একদিন উসমান বিন তালহা (রা.) তাকে নামাযরত অবস্থায় দেখে ফেলেন এবং তার মা ও পরিবারের সদস্যদেরকে বলে দেন। তার পিতামাতা তাকে বন্দি করে রাখে। আর তিনি হিজরত করে আবিসিনিয়া গমনের পূর্ব পর্যন্ত বন্দিই ছিলেন। তিনি সুযোগ পেয়ে বাহিরে আসেন এবং হিজরত করেন। কিছুকাল পর কতিপয় মুহাজির আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসেন, হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)ও তাদের একজন

ছিলেন। তার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে তার মা বিরোধিতা পরিত্যাগ করে এবং ছেলেকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেয়।

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) দু'বার হিজরত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি প্রথমে আবিসিনিয়ায় এবং পরবর্তীতে মদীনায় হিজরত করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬, মুসআব বিন উমায়ের (রা.) বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৫, মুসআব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে আমি স্বাচ্ছন্দ্যের যুগেও দেখেছি আর মুসলমান হওয়ার পরও (দেখেছি)। ইসলামের খাতিরে তিনি এত দুঃখ সহ্য করেছেন যে, আমি দেখেছি তার শরীর থেকে চামড়া সেভাবে খসে পড়ছিল যেভাবে সাপের খোলস পড়ে যায় এবং নতুন চামড়া গজায়। **(আস্ সীরাতুন্ নবুবীয়্যাহ্ লি-ইবনে ইসহাক, পৃঃ ২৩০, মান উয্যিবা ফিল্লাহি বি মাক্কাতা মিনাল মু'মিনীন, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যা থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত)**

এগুলো কুরবানীর এমন সব উন্নত মান যা অতি বিস্ময়কর।

একদিন মুসআব বিন উমায়ের (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন যখন তিনি (সা.) স্বীয় সাহাবীদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন হযরত মুসআব (রা.)'র পরিহিত কাপড়ে চামড়ার তালি লাগানো ছিল। কোথায় সেই উন্নত মানের পোশাক আর কোথায় মুসলমান হওয়ার পর এই দুরাবস্থা যে, (কাপড়ে) চামড়ার তালি লাগানো ছিল। সাহাবীগণ হযরত মুসআব (রা.)-কে দেখে নিজেদের মাথা নত করে রাখেন, কেননা তারাও হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র এরূপ পরিবর্তিত অবস্থায় কোন প্রকার সাহায্য করতে অক্ষম ছিলেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) এসে সালাম করেন। মহানবী (সা.) সালামের উত্তর দেন এবং তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র) জগৎপূজারীদের জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি হোক। আমি মুসআবকে সেই যুগে দেখেছি যখন মক্কা নগরীতে তার চেয়ে অধিক সম্পদশালী ও প্রাচুর্যশালী আর কেউ ছিল না। তিনি পিতামাতার সবচেয়ে আদরের সন্তান ছিলেন, কিন্তু খোদা এবং তাঁর রসূলের ভালোবাসা তাকে আজ এই অবস্থায় এনে উপনীত করেছে আর তিনি সেসবকিছু খোদা ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য পরিত্যাগ করেছেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬, মুসআব বিন উমায়ের (রা.) বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে দেখে তার পূর্বের সুখসাচ্ছন্দ্যময় অবস্থার কথা স্মরণ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন, যে অবস্থায় তিনি থাকতেন। মহানবী (সা.)-এর তার পূর্বের অবস্থা স্মরণ হয় আর (অন্যদিকে) এখন তিনি কতই না ত্যাগ স্বীকার করছেন।

হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) আসেন। তার দেহে চামড়ার তালি দেওয়া একটি চাদর ছিল। মহানবী (সা.) তাকে দেখে, তার বর্তমান অবস্থার তুলনায় পূর্বেকার সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা স্মরণ করে অশ্রুপাত করেন। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, তখন তোমাদের কীরূপ অবস্থা হবে যখন তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি সকালে এক পোশাক পরলে সন্ধায় অন্য পোশাক পরবে। অর্থাৎ এত প্রাচুর্য সৃষ্টি হবে যে, সকাল-সন্ধ্যা তোমরা পোশাক পরিবর্তন করবে। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, আর তার সামনে খাবারের একটি পাত্র রাখা হবে আর দ্বিতীয়টি সরানো হবে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার আহার্য

থাকবে আর বিভিন্ন পদের খাবার সামনে আসতে থাকবে, যেমনটি বর্তমান যুগের রীতি। তোমরা তোমাদের বাসা-বাড়িতে সেভাবে পর্দা টানাবে যেমনটি কাবা শরীফে গিলাফ পরানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ অত্যন্ত মূল্যবান পর্দা ব্যবহৃত হবে। এগুলো সম্পূর্ণরূপে বর্তমান যুগের দৃশ্য অথবা সেই স্বাচ্ছন্দ্যের দৃশ্য যা মুসলমানরা পরবর্তী যুগে লাভ করেছিল। সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কি তখন আজকের তুলনায় অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে থাকব আর ইবাদতের জন্য অবসর থাকব? অর্থাৎ এমন স্বাচ্ছন্দ্য থাকলে এবং এরূপ অবস্থা যদি হয় তাহলে কি আমরা ইবাদতের জন্য সম্পূর্ণ অবসর থাকব এবং কষ্ট ও পরিশ্রম করা থেকে রক্ষা পাবো? তখন মহানবী (সা.) বলেন, না, বরং তোমরা আজ সেই দিনগুলোর চেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছ। **(সূনান তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুল ক্বিয়ামাহ্, হাদীস নংঃ ২৪৭৬)** তোমাদের অবস্থা, তোমাদের ইবাদত, তোমাদের মান তার চেয়ে অনেক উন্নত যা পরবর্তীতে আগমনকারীদের স্বাচ্ছন্দ্যের আদলে লাভ হবে।

সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আবিসিনিয়ায় হিজরত সম্পর্কে লিখেছেন, যার কিছুটা পূর্বে অন্যান্য সাহাবীর স্মৃতিচারণে আমি উল্লেখ করেছি। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে পঞ্চম নববীর রজব মাসে ১১জন পুরুষ এবং ৪জন নারী আবিসিনিয়া অভিমুখে হিজরত করেন। তাদের মাঝে হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)ও ছিলেন। তিনি (রা.) লিখেন, অদ্ভুত বিষয় হল, প্রাথমিক মুহাজিরদের অধিকাংশ তারা ছিল যারা কুরাইশদের শক্তিশালী গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, আর দুর্বল লোক কম দৃষ্টিগোচর হয়, যা থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়। প্রথমত– শক্তিশালী গোত্রগুলোর সদস্যরাও কুরাইশদের নির্যাতন থেকে নিরাপদ ছিল না। দ্বিতীয়ত– দুর্বল শ্রেণি যেমন ক্রীতদাস প্রমুখরা তখন এতটাই দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় ছিলেন যে, তাদের হিজরত করার মতো সামর্থ্যও ছিল না। যাহোক, মক্কার কুরাইশরা যখন তাদের হিজরতের কথা জানতে পারে তখন তারা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয় যে, এই শিকার আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলো। অতএব তারা এই মুহাজিরদের পিছু ধাওয়া করে, কিন্তু তাদের লোকেরা যখন সমুদ্রতীরে পৌঁছে ততক্ষণে জাহাজ ছেড়ে গিয়েছিল তাই তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। আবিসিনিয়ায় পৌঁছে মুসলমানরা খুবই শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করে আর খোদার কৃপায় কুরাইশদের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ হয়। **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এর প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ১৪৬-১৪৭}**

আকাবার প্রথম বয়আতের সময় মদীনা থেকে আগত ১২জন মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেন। তারা যখন মদীনায় ফিরে যাচ্ছিলের তখন মহানবী (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে তাদেরকে কুরআন পড়ানো এবং ইসলামী শিক্ষা প্রদানের জন্য সাথে প্রেরণ করেন। মদীনায় তিনি (রা.) 'ক্বারী' এবং 'মুক্বরী' অর্থাৎ শিক্ষক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। **{উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৫-১৭৬, মুসআব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {আল্ ইস্তিয়াব ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭, মুসআব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত}, {আস্ সীরাতুন্ নবুবীয়্যাহ্ লি-ইবনে হিশাম, পৃঃ ১৯৯, বাব ইরসালুর রসূল (সা.) মুসআব বিন উমায়ের মায়া ওয়াফদিল আকাবাহ্, বৈরুতের দারুল হযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত}**

(তিনি) 'মুক্বরী' অর্থাৎ শিক্ষক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী অওস এবং খাযরাজ গোত্রের আনসারীরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, আমাদের কুরআন পড়ানোর জন্য কাউকে প্রেরণ করুন। তখন মহানবী (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে প্রেরণ করেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১, বাব যিকরুল আকাবাতিল উলা আল্ ইসনায়ে আশার, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

হযরত মুসআব (রা.) মদীনায় হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্ (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন। তিনি নামাযে ইমামের দায়িত্বও পালন করতেন। **{আস্ সীরাতুন্ নবুবীয়্যাহ্ লি-ইবনে হিশাম, পৃঃ ১৯৯, বাব ইরসালুর রসূল (সা.) মুসআব বিন উমায়ের মায়া ওয়াফদিল আকাবাহ্, বৈরুতের দারুল হযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত}**

হযরত মুসআব (রা.) দীর্ঘকাল হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্ (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন, কিন্তু পরবর্তীতে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র বাড়িতে স্থানান্তরিত হন। **(শাহ্ মঈন উদ্দীন আহমদ নদভী রচিত সীরাতুস্ সাহাবাহ্, ২য় খণ্ড, মুহাজিরীন প্রথম অংশ, পৃঃ ২৭২, করাচীর উর্দূ বাজারস্থ দারুল্ ইশায়াত থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত)**

হযরত বারা বিন আযেব (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর মুহাজির সাহাবীদের মাঝে সর্বপ্রথম আমাদের কাছে মদীনায় আগমনকারী ছিলেন মুসআব বিন উমায়ের (রা.) এবং ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)। মদীনায় পৌঁছে এই উভয় সাহাবী আমাদেরকে পবিত্র কুরআন পড়াতে আরম্ভ করেন। এরপর আম্মার (রা.), বেলাল (রা.) এবং সা'দ (রা.) আসেন এবং হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) সাহাবীদের সাথে নিয়ে আসেন; এরপর মহানবী (সা.) আগমন করেন। তিনি বলেন, আমি কখনো মদিনাবাসীদের এত আনন্দিত হতে দেখি নি যতটা তারা মহানবী (সা.)-এর আগমনে আনন্দিত হয়েছিল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও বলতে থাকে, **'আপনি আল্লাহ্‌র রসূল, আমাদের কাছে এসেছেন'**। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত্ তফসীরুল কুরআন, বাব সূরা আল্ আ'লা, হাদীস নংঃ ৪৯৪১)**

সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) সম্পর্কে আরো বর্ণনা করেন,

"দ্বারে আরকামে যেসব ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করেছিলেন তারাও সাবেকীনদের (অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়নকারীদের) মাঝে গণ্য হন। তাদের মাঝে অধিক প্রসিদ্ধ হলেন- প্রথমত মুসআব বিন উমায়ের (রা.), যিনি বনু আব্দুদ্ দ্বার গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং খুবই সুদর্শন ও সুপুরুষ ছিলেন আর নিজ বংশের খুবই স্নেহভাজন ও প্রিয় ছিলেন। তিনি সেই যুবক বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব যাকে হিজরতের পূর্বে মদীনায় ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং যার মাধ্যমে মদীনায় ইসলাম প্রসার লাভ করে।" **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এর প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ১২৯}**

এছাড়া আরেকটি জীবনী গ্রন্থে লেখা আছে, হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি হিজরতের পূর্বে মদীনায় জুমুআর নামায পড়িয়েছেন। হযরত মুসআব (রা.) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর সমীপে মদীনায় জুমুআর নামাযের জন্য অনুমতি চাইলে মহানবী (সা.) অনুমতি প্রদান করেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) মদীনায় হযরত সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.)'র বাড়িতে প্রথম জুমুআ পড়িয়েছেন। তাতে মদীনার ১২জন অংশগ্রহণ করেন। এ উপলক্ষ্যে তারা একটি ছাগল জবাই করেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) ইসলামে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি জুমুআর নামায পড়িয়েছেন। কিন্তু ভিন্ন একটি রেওয়ায়েতও রয়েছে, সে অনুযায়ী হযরত আবু উমামাহ্ আসআদ বিন যুরারাহ্ (রা.) হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মদীনায় প্রথম জুমুআ পড়িয়েছেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা**

লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৭-৮৮, মুসআব বিন উমায়ের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, (আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১, বাব যিকরুল আকাবাতিল উলা আল্ ইসনায়ে আশার, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)

যাহোক, হযরত মুসআব (রা.) প্রথম মুবাল্লিগ ছিলেন। হযরত মুসআব (রা.) হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্ (রা.)-কে সাথে নিয়ে আনসারীদের বিভিন্ন পাড়ায় তবলীগের উদ্দেশ্যে যেতেন। হযরত মুসআব (রা.)'র তবলীগে অনেক সাহাবী মুসলমান হন যাদের মাঝে জ্যেষ্ঠ সাহাবী যেমন– হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.), হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.), হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.), হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **{আস্ সীরাতুন্ নবুবীয়্যাহ্ লি-ইবনে হিশাম, পৃঃ ২০০, বাব আউয়ালু জুমআতিন উকীমাত বিল্ মদীনাহ্, বৈরুতের দারুল হযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত}, (আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২১, ৩২৭,৩৩৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

হযরত মুসআব (রা.)'র তবলীগি চেষ্টা-প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন,

"মক্কা থেকে বিদায়-বেলায় এই ১২জন নওমুসলিম অনুরোধ করেন, কোন একজন ইসলামী শিক্ষককে আমাদের সাথে প্রেরণ করা হোক, যিনি আমাদেরকে ইসলামের শিক্ষা প্রদান করবেন আর আমাদের মুশরিক ভাইদের (মাঝে) ইসলামের তবলীগ করবেন। তিনি (সা.) আব্দুদ্ দ্বার গোত্রের একজন অতি নিষ্ঠাবান যুবক মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে তাদের সাথে প্রেরণ করেন। সেকালে ইসলামী মুবাল্লিগরা 'ক্বারী' বা 'মুক্বরী' নামে আখ্যায়িত হতো, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কাজ ছিল পবিত্র কুরআন শোনানো। আর এটিই ইসলামের তবলীগের সর্বোত্তম মাধ্যম ছিল। অতএব মুসআব (রা.)ও মদীনায় 'মুক্বরী' নামে সুখ্যাতি লাভ করেন। মুসআব (রা.) মদীনায় পৌঁছে আসাদ বিন যুরারাহ্ (রা.)'র বাড়িতে উঠেন, যিনি মদীনার সর্বপ্রথম মুসলমান ছিলেন। আর এমনিতেও তিনি একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও প্রভাবশালী বুযুর্গ ছিলেন। এই বাড়িকেই তিনি নিজের তবলীগি কেন্দ্র বানান আর নিজ দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি নিমগ্ন হয়ে পড়েন। মদীনায় যেহেতু মুসলমানদের একটি সমষ্টিগত জীবন যাপনের সুযোগ হয়, আর তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ জীবন ছিল, তাই আসআদ বিন যুরারাহ্ (রা.)'র প্রস্তাবে মহানবী (সা.) মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে জুমুআর নামাযের নির্দেশ প্রদান করেন। এভাবে মুসলমানদের সমষ্টিগত জীবনের সূচনা হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার এমন কৃপা হয় যে, কিছুকালের মধ্যেই মদীনায় ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা আরম্ভ হয়ে যায় আর অওস ও খাযরাজ গোত্র অতি দ্রুত মুসলমান হতে আরম্ভ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এক দিনেই একটি পুরো গোত্র মুসলমান হয়ে যায়। অতএব বনু আব্দিল আশ্হাল গোত্রও এভাবেই একই সময়ে সবাই মুসলমান হয়েছিল। এই গোত্রটি আনসারদের প্রসিদ্ধ অওস গোত্রের একটি স্বতন্ত্র অংশ ছিল আর এই গোত্রের নেতার নাম ছিল সা'দ বিন মু'আয (রা.), যিনি শুধু বনু আব্দুল আশ্হাল গোত্রেরই সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন না বরং অওস গোত্রেরও সর্দার ছিলেন। মদীনায় যখন ইসলামের প্রচার কার্য চলতে থাকে তখন সা'দ বিন মু'আযের কাছে তা ভালো লাগে নি তাই তিনি এটিকে প্রতিহত করতে চান।" ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সা'দ বিন মু'আয (রা.) চরম বিরোধী ছিলেন। "কিন্তু আসআদ বিন যুরারাহ্ (রা.)'র সাথে তার নিকটাত্মীয়তা ছিল। অর্থাৎ তারা পরস্পর খালাতো ভাই ছিলেন আর আসআদ মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তাই সা'দ বিন মুআয (রা.) নিজে কোন বিষয়ে সরাসরি নাক গলানো থেকে বিরত থাকতেন পাছে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ না সৃষ্টি হয়। অতএব তিনি তার অপর এক আত্মীয় উসায়েদ বিন আল হুযায়েরকে বলেন, আসআদ বিন যুরারাহ্'র কারণে

আমি কিছুটা দ্বিধান্বিত।" অর্থাৎ সে মুসলমান হয়ে গেছে এবং তার অবস্থান থেকে তবলীগ করার ক্ষেত্রে সহায়তাও করছে। "কিন্তু তুমি গিয়ে মুসআব (রা.)-কে বাধা দাও।" অর্থাৎ আসআদ বিন যুরারাহ্ (রা.)-কে থামানোর পরিবর্তে হযরত মুসআব (রা.)-কে বাধা দাও। "যেন তিনি আমাদের লোকজনের মাঝে এই ধর্মহীনতার প্রসার না করেন আর আসআদকেও বলে দাও, এই রীতি ভালো নয়। উসায়েদ আব্দুল আশহাল গোত্রের বিশিষ্ট নেতাদের একজন ছিলেন। এমনকি তার পিতা বুআস-এর যুদ্ধে গোটা অওস গোত্রের নেতা ছিলেন। সা'দ বিন মু'আয-এর পর উসায়েদ বিন আল হুযায়রেরও নিজ গোত্রের ওপর অনেক প্রভাব ছিল। অতএব সা'দ-এর কথামত তিনি মুসআব বিন উমায়ের (রা.) এবং আসআদ বিন যুরারাহ্ (রা.)'র কাছে যান এবং মুসআব (রা.)-কে সম্বোধন করে রাগত স্বরে বলেন, তুমি কেন আমাদের লোকজনকে ধর্মচ্যুত করছ? এ থেকে নিবৃত্ত হও, নতুবা পরিণতি ভালো হবে না। মুসআব (রা.) কোন উত্তর দেয়ার পূর্বেই আসআদ (রা.) ক্ষীণকণ্ঠে মুসআবকে বলেন, তিনি তার গোত্রের একজন প্রভাবশালী নেতা। তার সাথে খুবই নম্রতা ও ভালোবাসার স্বরে কথা বলবেন। অতএব মুসআব (রা.) অত্যন্ত বিনয় এবং আন্তরিকতার সাথে উসায়েদকে বলেন, আপনি রাগ করবেন না, বরং অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণের জন্য বসুন আর প্রশান্তচিত্তে আমাদের কথা শুনুন, এর পরই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হোন। উসায়েদ এই প্রস্তাবকে যৌক্তিক মনে করে বসে পড়েন।" তিনি পুণ্য স্বভাবী ছিলেন। "মুসআব (রা.) তাকে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শোনান এবং পরম ভালোবাসার সাথে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেন। উসায়েদ-এর ওপর এর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, তিনি সেখানেই মুসলমান হয়ে যান এবং এরপর বলেন, আমার পেছনে এমন এক ব্যক্তি রয়েছেন যিনি ঈমান আনলে আমাদের পুরো গোত্র মুসলমান হয়ে যাবে। তোমরা অপেক্ষা কর, আমি এখনই তাকে এখানে প্রেরণ করছি। একথা বলার পর উসায়েদ উঠে চলে যান এবং কোন অজুহাতে সা'দ বিন মুআযকে মুসআব বিন উমায়ের এবং আসআদ বিন যুরারাহ্ (রা.)'র কাছে প্রেরণ করেন। সা'দ বিন মুআয আসেন অত্যন্ত অত্যন্ত রাগতস্বরে আসআদ বিন যুরারাহ্ (রা.)-কে বলেন, দেখ আসআদ! তুমি নিজের আত্মীয়তার অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করছ, এটি ঠিক নয়।" এখন আমি আত্মীয়তার কারণে চুপ করে আছি কিন্তু তুমি সুযোগের অপব্যবহার করো না। "তখন মুসআব (রা.) পূর্বের মতোই নম্রতা ও ভালোবাসার সাথে তাকে শান্ত করেন।" যেমনটি আগেরজনের সাথে করেছিলেন। "আর তিনি (রা.) বলেন, আপনি কিছুক্ষণের জন্য বসে আমার কথাটা শুনুন, এরপর এতে যদি কোন বিষয় আপত্তিকর মনে হয় তাহলে (নির্দ্বিধায়) প্রত্যাখ্যান করুন। সা'দ বলেন, ঠিক আছে, এটি তো খুবই যৌক্তিক একটি দাবি। এরপর নিজের বর্শা গেঁড়ে তিনি বসে পড়েন। মুসআব (রা.) পূর্বের মতোই প্রথমে পবিত্র কুরআন পাঠ করেন, এরপর নিজস্ব হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে ইসলামী শিক্ষার ব্যাখ্যা করেন। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই এই প্রতিমাও বশীভূত হয়।" অর্থাৎ সা'দ বিন মু'আয (রা.)ও এসব কথা শুনে বশীভূত হয়ে যান। "অতএব সা'দ নির্ধারিত পদ্ধতিতে গোসল করে কলেমা শাহাদাত পাঠ করেন আর এরপর সা'দ বিন মু'আয এবং উসায়েদ বিন আল্ হুযায়ের উভয়ে একত্রে নিজ গোত্রের লোকজনের কাছে যান আর বিশেষ আরবী রীতিতে সা'দ (রা.) তাদের জিজ্ঞেস করেন, হে আব্দুল আশ্হাল গোত্রের সদস্যরা! আমার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা? উত্তরে সবাই সমস্বরে বলে, আপনি আমাদের নেতা বরং নেতার পুত্র নেতা, আপনার কথায় আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। সা'দ বলেন, তাহলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত

তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অতঃপর সা'দ তাদেরকে ইসলামী শিক্ষামালা অবহিত করেন আর সেদিন সন্ধ্যা নামার পূর্বেই পুরো গোত্র মুসলমান হয়ে যায়। সা'দ (রা.) এবং উসায়েদ স্বয়ং নিজেদের হাতে তাদের গোত্রের প্রতিমা বের করে ভেঙে ফেলেন।

সা'দ বিন মু'আয (রা.) এবং উসায়েদ বিন আল হুযায়ের (রা.), যারা সেদিন মুসলমান হয়েছিলেন, তারা উভয়েই শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের মাঝে গণ্য হন।" হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, " তারা নিঃসন্দেহে আনসারীদের মাঝে অনেক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন।" এতে কোন সন্দেহ নেই, তারা অনেক মর্যাদাবান ছিলেন। "বিশেষত সা'দ বিন মু'আয (রা.) মদীনার আনসারীদের মাঝে সেই মর্যাদা লাভ করেন যা মক্কার মুহাজিরদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) লাভ করেছিলেন। এই যুবক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, পরম বিশ্বস্ত এবং ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার একজন নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক প্রমাণিত হন। আর তিনি যেহেতু স্বগোত্রের সর্বোচ্চ নেতাও ছিলেন এবং অত্যন্ত মেধাবীও ছিলেন, তাই ইসলামে তিনি সেই পদমর্যাদা লাভ করেন যা কেবল বিশেষ নয় বরং বিশিষ্ট সাহাবীরা লাভ করেছিলেন।" হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, কোন সন্দেহ নেই, যৌবনে তার মৃত্যুতে মহানবী (সা.)-এর এই কথা বলা যে, সা'দ (রা.)'র মৃত্যুতে রহমান খোদার আরশও কেঁপে উঠেছে, এটি এক পরম সত্যভিত্তিক উক্তি ছিল। মোটকথা, এভাবেই দ্রুতগতিতে অওস ও খাযরাজ গোত্রে ইসলাম বিস্তার লাভ করতে থাকে। ইহুদীরা ভয়ার্ত চোখে এসব দৃশ্য দেখত আর মনে মনে বলত, আল্লাহ্ই জানে কী হতে যাচ্ছে।" **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এর প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ২২৪-২২৭}**

হযরত মুসআব (রা.)'র তবলীগে অনকে মানুষ মুসলমান হয়। তিনি (রা.) ১৩ নববী'তে হজ্জের সময় মদীনা থেকে ৭০জন আনসারীর প্রতিনিধি দল নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বিভিন্ন রেওয়ায়েত এর আলোকে সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে লিখেন,

"পরের বছর অর্থাৎ ১৩ নববী'র যিলহজ্জ মাসে হজ্জের সময় অওস এবং খাযরাজ গোত্রের কয়েকশ' মানুষ মক্কায় আসে। তাদের মধ্যে ৭০জন এমন ছিলেন যারা হয় মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন অথবা এখন মুসলমান হতে চাচ্ছিলেন আর মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছিলেন। মুসআব বিন উমায়ের (রা.)ও তাদের সাথে ছিলেন। মুসআব (রা.)'র মা জীবিত ছিলেন, তিনি মুশরিকা হলেও তাকে অনেক ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাকে সংবাদ পাঠান, প্রথমে আমার সাথে এসে সাক্ষাৎ কর, তারপর অন্যত্র যেও। মুসআব (রা.) উত্তরে বলে পাঠান, আমি এখনো মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি নি, তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাৎ করার পর আপনার কাছে আসব। অতএব তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অবহিত করার পর নিজের মায়ের কাছে যান।" এ কথা শুনে ও এটি দেখে যে, প্রথমে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে নি "সে (অর্থাৎ মা) রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বসে ছিল আর তাকে দেখার পর অনেক কান্নাকাটি এবং অনুযোগ-অভিযোগ করে। মুসআব (রা.) বলেন, মা! আমি তোমাকে খুবই উত্তম একটি কথা বলছি যা তোমার জন্য খুবই কল্যাণকর আর এতে সব বিবাদও মিটে যাবে। সে বলে, সেটি কী? মুসআব (রা.) মৃদুস্বরে উত্তর দেন, শুধু এতটুকুই যে, প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করে মুসলমান হয়ে যাও এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। সে কট্টর মুশরিকা ছিল, একথা শোনামাত্রই সে হৈচৈ আরম্ভ করে যে,

তারকারাজির শপথ! আমি কখনোই তোমার ধর্ম গ্রহণ করব না আর মুসআব (রা.)-কে ধরে বন্দি করার জন্য তার আত্মীয়স্বজনকে সে ইশারা করে। কিন্তু তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।" **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এর প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ২২৭)**

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র স্মৃতিচারণের কিছু কথা এখনো বাকি আছে যা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু আজ যেহেতু আমি দু'টি গায়েবানা জানাযা পড়াব আর তাদের স্মৃতিচারণও করতে হবে। তাই আপাতত এখানেই আমি হযরত মুসআব (রা.)'র স্মৃতিচারণ শেষ করছি, বাকিটা আগামী খুতবায় বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

যে দু'জনের জানাযা পড়াবো, তাদের মধ্যে একজন হলেন, মালেক মুজাফ্ফর আহমদ সাহেবের পুত্র মালেক মুনাওয়ার আহমদ জাভেদ সাহেব, যিনি গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। দীর্ঘদিন থেকে তার যকৃতের সমস্যা ছিল, যে কারণে দশদিন তাহের হার্ট–এ চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি আপন প্রভুর কাছে ফিরে যান। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তাঁর চার পুত্র এবং দু'কন্যা রয়েছে। মালেক মুনাওয়ার আহমদ জাভেদ সাহেবের দাদা ছিলেন, (সুবেদার মেজর) হযরত ডাক্তার জাফর হাসান সাহেব (রা.) এবং তার নানা ছিলেন, গুরুদাসপুর জেলার গাজীপুর নিবাসী হযরত শেখ আব্দুল করীম সাহেব (রা.)। আর তারা দাদা ছিলেন রান্ধাওয়ার ধরমকোট নিবাসী। উভয় বুযুর্গ অর্থাৎ (প্রয়াতের) দাদা ও নানা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছেন এবং সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করেন। ১৯৬৮ সনে মরহুম সূফী হামেদ সাহেবের কন্যা সালমা জাভেদ সাহেবাকে তিনি বিয়ে করেন, যিনি মরিশাসের মুবাল্লিগ এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত হাফেয সূফী গোলাম মোহাম্মদ সাহেব (রা.)'র পৌত্রী এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত ডাক্তার জাফর হাসান সাহেব (রা.)'র দৌহিত্রী ছিলেন। মরিশাসে পদায়িত মুবাল্লিগ হযরত সূফী গোলাম মোহাম্মদ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ৩১৩ জন সাহাবীর একজন ছিলেন। একইভাবে মালেক মুনাওয়ার জাভেদ সাহেবের দাদা ও নানা এবং তার স্ত্রীর দাদা ও নানা চারজনই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সাহাবী ছিলেন।

নিজের জীবন উৎসর্গ করা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে মালেক সাহেব একবার বলেন, ওয়াক্ফের প্রতি আমার মনোযোগ এভাবে নিবদ্ধ হয়, অর্থাৎ যখন আমি ১৯৮২ সনে আনসারুল্লাহ্র ইজতেমায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র বক্তব্য শুনছিলাম, তখন হুযূর তাঁর বক্তব্যে ওয়াক্ফের গুরুত্ব বর্ণনা করেন আর বক্তৃতার শেষদিকের একটি বাক্য, যার মর্ম ছিল, তুমি কি চাওনা; ওয়াক্ফ অবস্থায় তোমার শেষ নিঃশ্বাস হোক? তিনি বলেন, এই বাক্যটি আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আমি ভাবতে থাকি, আমিও ওয়াক্ফ করতে পারবো কি? যাহোক, এরপর তিনি জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন আর ১০ আগস্ট ১৯৮৩ সনে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র সমীপে জীবন উৎসর্গের আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, যা ১৯৮৩ সনের ১৮ আগস্ট তারিখে হুযূর (রাহে.) গ্রহণ করেন এবং ওয়াক্ফ মঞ্জুর করে এই নির্দেশ দেন, আপনি আপনার কাজকর্ম গুছিয়ে চলে আসুন। সে সময় তিনি ব্যবসাও করতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৩ সনের ২৮ আগস্টে তাকে প্রাথমিকভাবে ওকালত সানাত ও তিজারত-এ পদায়ন করেন। ১লা অক্টোবর, ১৯৮৩ সনে তিনি ওকালত সানাত ও তিজারত-এ যোগদান করেন। ওয়াক্ফ করার পূর্বে

প্রাথমিক ১৬ বছর তিনি পাঞ্জাব সরকারের সচিবালয়ে চাকরি করেন। এরপর প্রায় ১০ বছর ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। ১৯৮৩ সনের নভেম্বর মাসে তিনি রিভিউ ও রিলিজিয়ন্স পত্রিকার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৯৮৪ সনে সহকারী নাযের যিয়াফত নিযুক্ত হন। ১৯৮৭ সনের ২০ এপ্রিল থেকে ২০১৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি নায়েব নাযের যিয়াফত হিসেবে দায়িত্ব পালনের তৌফিক লাভ করেন। ১৯৯০ সনে একশ' এতীমের দেখাশোনা বা তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত যে কমিটি গঠিত হয়, তিনি এর প্রথম সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং প্রায় ২০ বছর পর্যন্ত তিনি এই সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, লাহোরের জেলা ও আঞ্চলিক কায়েদ ছিলেন, আর প্রায় দশ বছর এখানে সেবা করেন। ১৯৮৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত তিনি আনসারুল্লাহ্‌তে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত প্রায় ৩১বছর আনসারুল্লাহ্ পাকিস্তানের কায়েদ তাহরীকে জাদীদ, কায়েদ তরবীয়ত, কায়েদ ইশায়াত এবং শেষ ৫বছর মজলিসে আনসারুল্লাহ্, পাকিস্তানের নায়েব সদর হিসেবে সেবা করার তৌফিক লাভ করেন।

তিনি যখন সরকারী চাকরি করতেন সে সময়কার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে একবার মালেক সাহেব বলেন, কর্মক্ষেত্রে আমাদের একজন ইনচার্জ ছিলেন, যিনি খুবই বিদ্বেষপরায়ণ মানুষ ছিলেন এবং প্রায় সময় মোবাহেসা বা বিতর্ক করার জন্য মৌলভীদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসতেন। এভাবে একবার তিনি আল্লামা অধ্যাপক খালেদ মাহমুদ সাহেবকে নিয়ে আসেন, যিনি সে যুগের একজন নামকরা আলেম ছিলেন। তার সাথে বিতর্ক আরম্ভ হয়। আলেম সাহেব যখন কথায় পেরে উঠছিলেন না তখন রাগের বশে গালি দিতে আরম্ভ করে, যেমনটি সাধারণ মৌলভীদের রীতি হয়ে থাকে। তিনি বলেন, তখন আমার যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন তিনি ভয় পেয়ে যান যে, কোথাও আবার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায়। তখন সেই আল্লামা সাহেব আমার ইনচার্জ আব্দুর রহমান সাহেবকে সাহস যোগানোর জন্য বলেন, মৌলভী সাহেবের এই বাক্য এমন যা থেকে বুঝা যায়, জামা'তের সদস্যদের যে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক রয়েছে, তিনি আন্তরিকভাবে তা বিশ্বাস করতেন। এই মওলানা সাহেব বলেন, এরা খোদা, রসূল এবং কিতাব অর্থাৎ, ঐশী বাণীর প্রতি এত বেশি যুলুম বা অন্যায় করেছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। (অর্থাৎ, আল্লাহ্, রসূল এবং পবিত্র কুরআনের প্রতি আহমদীরা এত বেশি যুলুম করেছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন) কিন্তু কেন ধ্বংস করেন নি? মওলানা সাহেব বলেন, এরা প্রত্যেকবার বেঁচে যায় এ কারণে যে, তারা নিজেদের নামাযে খুব কান্নাকাটি করে। মালেক সাহেব বলেন, তখন আমি তাকে বলি, আল্লামা সাহেব! আপনি এই কথাটি আমাকে লিখে দিন। তিনি বলেন, কেন? পাঞ্জাবী ভাষায় বলেন, **'আজ আমি লিখে দিলে কালই তুমি তা পত্রপত্রিকায় ছাপিয়ে দিবে'**। এর অর্থ হল, তিনি এটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, আহমদীদের আহাজারি বা কাকুতিমিনতি সর্বদা তাদের কাজে আসে আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের দোয়া শোনেন। আমাদেরকে ভুল মনে করা সত্ত্বেও তারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের (দোয়া) শোনেন। আল্লাহ্ তা'লা এদের দৃষ্টি উন্মোচন করুন। আর তারা জাতিকে যে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করছে, ভুল পথনির্দেশনা দিচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা জাতিকে এদের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে রক্ষা করুন।

আমাদের সহকারী নাযের যিয়াফত ওসামাহ্ আজহার সাহেব বলেন, মালেক মুনাওয়ার আহমদ জাভেদ সাহেব উন্নত মানের প্রশাসনিক দক্ষতা রাখতেন, রাতে জেগে

দারুয্ যিয়াফত ঘুরে দেখতেন, কর্মীদের নিকট থেকে তথ্যাদি নিয়ে আবহাওয়া অনুসারে তাদের জন্য চা ও ডিম ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেন। দারুয্ যিয়াফত বা অতিথিশালার কর্মীদের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা, স্নেহ ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ছিল। সকল কর্মীর পারিবারিক অবস্থার খবরাখবর রাখতেন আর গোপনে তাদের যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্যও করতেন।

তার জামাতা ও ভাগ্নে নাদীম সাহেব বলেন, প্রধানত মালেক সাহেব আমাকে সবসময় নামায পড়ার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতেন আর খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও ধর্মসেবার বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতেন। একবার তিনি আমাকে বলেন, অবসর গ্রহণের পর একদিন আমি সিদ্ধান্ত নেই, যেহেতু আমি অবসর গ্রহণ করেছি, তাই এখন আমি আমার ঐচ্ছিক চাঁদা অর্ধেক করে দিব; কেননা আয় বা বেতন কমে গেছে। অতএব, আমি আমার সব ওয়াদার একটি তালিকা প্রস্তুত করে ঘুমিয়ে পড়ি। তিনি বলেন, রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, খোদা তা'লা আমার কাছে এসেছেন আর বলেন, আমি বিশ্বজগতের খোদা। আমি শুনেছি তুমি তোমার চাঁদা অর্ধেকে নামিয়ে এনেছ, চল, আমি তোমাকে আমার এই বিশ্বজগৎ পরিভ্রমণ করাই। অতঃপর স্বপ্নে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তাঁর পাহাড়, জঙ্গল, উপত্যকা, নদ-নদী ও বাগান দেখান এবং বলেন, যেখানে সবকিছুর মালিক আমি সেখানে তোমার কিসের চিন্তা? তিনি বলেন, এ পর্যন্ত কথা শোনার পর আমি জেগে উঠি, আর আমি চাঁদা অর্ধেকে নামিয়ে আনার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তা পরিত্যাগ করি; আর রীতিমত পূর্বের ন্যায় চাঁদা দিতে থাকি।

তাঁর স্ত্রী বলেন, জীবন উৎসর্গ করার পূর্বে তিনি যখন ব্যবসা করতেন তখন মোটা অংকের টাকা পকেটে নিয়ে শীতের রাতে (গায়ে) চাদর জড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন আর বলতেন, এখন যে অভাবীকে পাব সে সত্যিই অনেক অভাবী হবে। এভাবে একবার খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এক ব্যক্তি পথে দাঁড়িয়ে ছিল আর সে বলল, তার মা খুবই অসুস্থ, অথচ তার কাছে কোন টাকা নেই। তিনি সব টাকা তাকে দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন।

সহকারী নাযের যিয়াফত মুরব্বী সিলসিলাহ্ আসিফ মজীদ সাহেব বলেন, কখনও কখনও জনসমাগম বেশি হওয়ায় অতিথিদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে হিমশিম খেতে হতো। কোন কোন অতিথি প্রকাশ্যে, বরং অফিসে এসেও অনেক কঠোর বাক্যবানে জর্জরিত করতেন। কিন্তু মরহুম অত্যন্ত হাসিমুখে সব কথা শুনতেন। তিনি বলেন, আর কখনও কখনও আমি তাকে করজোড়ে ক্ষমা চাইতেও দেখেছি। মরহুম যেসব অতিথির কাছে ক্ষমা চাইতেন তাদের কেউ কেউ তাঁর সন্তানদের সমবয়সী হতো। একবার অতিথিদের প্রস্থানের পর আমি নিবেদন করি, মালেক সাহেব! এই বাচ্চার কাছে আপনার করজোড়ে ক্ষমা চাওয়া আমার জন্য খুবই মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে। তিনি বলেন, তোমার কেন কষ্ট হয়েছে? আমি করজোড় করেছি, তুমি নও। আর স্মরণ রেখো, তারা যাঁর অতিথি, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর, তিনি অতিথিদের মনজয়ের জন্য খালি পায়ে ছুটে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

আসিফ সাহেব আরো বলেন, একবার এই অধম তার অফিসে বসে ছিলাম, তখন তিনি একটি ঘটনা শোনান, একদিন এক বয়স্ক লোক রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে আমার অফিসে প্রবেশ করেন আর পাঞ্জাবী ভাষায় আমাকে (অর্থাৎ মালেক সাহেবকে) সম্বোধন করে বলেন, তুমি কি মালেক মুনাওয়ার জাভেদ? মালেক সাহেব বলেন, হ্যাঁ, আমিই মালেক মুনাওয়ার জাভেদ। তখন সেই বয়স্ক অতিথি পাঞ্জাবী ভাষায় বলেন, এটি কি তোমার বাবার অতিথিশালা? মালেক সাহেব বলেন, না, বাবাজী! এটি আমাদের উভয়ের পিতা হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.)-এর অতিথিশালা বা এজমালি লঙ্গরখানা। এ উত্তর শুনে সেই বয়স্ক ব্যক্তি আশ্বস্ত হন আর এরপর অত্যন্ত শান্তভাবে ও ভালোবাসার সাথে নিজের সমস্যার কথা বলেন এবং চলে যান।

কখনও কখনও অতিথিরাও বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। আমার কাছেও অভিযোগ আসে যে, দারুয্ যিয়াফতে বা অতিথিশালায় এমন দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তদন্তের পর জানা যায় অতিথিদেরও ধৈর্য নেই। আমাদের বা আমাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অবশ্যই তাদের অর্থাৎ অতিথিদের সম্মান করা উচিত, কিন্তু অতিথিদেরও উচিত উন্নত আচারআচরণ প্রদর্শন করা আর কোন সময় এরূপ পরিস্থিতি দেখা দিলে ব্যবস্থাপনার সাথে সহযোগিতার চেষ্টা করা উচিত। যাহোক, মালেক সাহেব ওয়াক্ফ হিসেবে নিজের দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে পালন করেছেন। আমি যখন যুগপৎ নাযের আলা ও নাযের যিয়াফত ছিলাম তখন তিনি নায়েব নাযের যিয়াফত ছিলেন। আমি দেখেছি, তিনি জামা'তের সহায়সম্পত্তির (রক্ষণাবেক্ষণের) বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন আর সত্য-সঠিক কথা বলা থেকে কখনও বিরত থাকতেন না। যদিও তিনি আমার সহকারী ছিলেন, কিন্তু তার মতে কোন বিষয় জামা'তের স্বার্থের অনুকূলে হলে আর আমি ভিন্ন কথা বলে থাকলে নির্দ্বিধায় আমার মতের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতেন এবং বলতেন, যদি আমরা এভাবে হলে বেশি কল্যাণকর হবে। সব ওয়াক্ফে যিন্দেগীর মাঝেই এই বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত; অর্থাৎ শিষ্ঠাচারের গণ্ডিতে থেকে নিজের মতামত সঠিকভাবে উপস্থাপন করা উচিত। খিলাফতের সাথে তাঁর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল অনেক উন্নতমানের যার বহিঃপ্রকাশ ঘটতো তার প্রতিটি পত্রে। যখনই সাক্ষাৎ করতেন, তার প্রতিটি সাক্ষাতে এর ধারণা পাওয়া যেতো– তিনি দু'বার আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার স্ত্রী-সন্তানদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দিন এবং তাদেরকে তার সকল পুণ্যকর্ম ধরে রাখারও তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হল, মোহতরম শেখ মাহবুব আলম খালেদ সাহেবের পুত্র জনাব প্রফেসর মুনাওয়ার শামীম খালেদ সাহেবের, যিনি ২০২০ সনের ১৬ ফেব্রুয়ারি, প্রায় ৮১ বছর বয়সে রাবওয়ায় ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। যেমনটি আমি বলেছি, তাঁর পিতা ছিলেন শেখ মাহবুব আলম খালেদ সাহেব, যিনি পূর্বে টিআই কলেজের প্রফেসর ছিলেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে নাযের বায়তুল মাল আম্দ নিযুক্ত করেন। দীর্ঘকাল তিনি নাযের বায়তুল মাল আম্দ হিসেবে সেবা করেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁকে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার 'সদর' নিযুক্ত করেন। শামীম খালেদ সাহেব তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। প্রয়াতের শোকসন্তপ্ত পরিবারে রয়েছেন তার দ্বিতীয় স্ত্রী শাহেদা মুনাওয়ার শামীম সাহেবা আর তার মরহুমা প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র কানাডা নিবাসী খালেদ আনোয়ার সাহেব। ১৯৬৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন যুগপৎ টিআই কলেজের অধ্যক্ষ ও সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার 'সদর' ছিলেন, তখন তিনি মসজিদ মুবারকে মুনাওয়ার শামীম খালেদ সাহেবের বিয়ে পড়িয়েছিলেন। তখন খলীফাতুল মসীহ্ সালেস হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব (রাহে.)'র বাক্য ছিল, "আমার আন্তরিক বন্ধু অধ্যাপক মাহবুব আলম খালেদ সাহেবের পুত্র অধ্যাপক মুনাওয়ার শামীম খালেদ সাহেব আমার কাছে আমার সন্তানদের মতো প্রিয়"। তার পিতার সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি

দীর্ঘ ২৮ বছর পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লায় সেবা প্রদান করেছেন। যতদিন কলেজ জাতীয়করণ করা হয় নি তিনি টিআই কলেজেই প্রফেসর হিসেবে কাজ করেছেন, আর এরপরও আমার মনে হয় তার জীবনের বেশিরভাগ সময় রাবওয়ার কলেজেই কেটেছে।

এটি তো আমি বলে দিয়েছি, তিনি মাহবুব আলম খালেদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। আর তার অর্থাৎ শামীম খালেদ সাহেবের দাদা ছিলেন খান সাহেব মৌলভী ফরযন্দ আলী সাহেব, যিনি লণ্ডন মসজিদের সাবেক ইমাম এবং নাযের বায়তুল মাল হিসেবেও কাজ করেছেন।

মুনাওয়ার শামীম খালেদ সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী শাহেদা সাহেবা বর্ণনা করেন, মুনাওয়ার শামীম খালেদ সাহেব বহু গুণের আধার ছিলেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল যুগ খলীফার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। জুমুআর খুতবা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং খুতবার গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো নোট করতেন। রীতিমত নামায ও রোযা পালনকারী, তাহাজ্জুদগুযার, জামা'তের সাথে পাঁচবেলার নামায আদায়কারী ছিলেন। অসুস্থতার কারণে মসজিদে যাওয়া যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন খুবই মর্মপীড়ায় ভুগতেন আর প্রায়শ বিগলিত কণ্ঠে বলতেন, আমি মসজিদে যেতে পারছি না। অসুস্থতার দিনগুলোও তিনি পরম ধৈর্য-স্থৈর্য ও সাহসিকতার সাথে কাটিয়েছেন। কখনও কোন কষ্ট প্রকাশ করেন নি, কোন অভিযোগ মুখে আনেন নি। সবসময় মুখে আলহামদুলিল্লাহ্ই ছিল। ধর্মসেবার ক্ষেত্রে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও পরিশ্রম তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। অতি নীরবে জামা'তের সেবা করতেন। অত্যন্ত স্নেহশীল, বিশ্বস্ত এবং ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শনকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কলেজে যখন পড়াতেন, তখন কিছুকাল আমিও তার ছাত্র ছিলাম। এরপর আমি যখন আমীরে মোকামী ও নাযের আলা নিযুক্ত হই তখন তিনি আমার প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করেন। কখনও এটি বুঝানোর চেষ্টা করেন নি যে, তুমি আমার ছাত্র ছিলে। নিযামে খিলাফত ও জামা'তের ব্যবস্থাপনার পরম আনুগত্যকারী ও মান্যকারী ছিলেন। আমার খিলাফতের আসনে আসীন হওয়ার পরও (আমার প্রতি) তার সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ছিল অসাধারণ।

আল্লাহ তা'লা তার প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন, নিজ প্রিয়দের চরণে তাকে ঠাঁই দিন। তার পরিবার-পরিজনকেও তার সকল পুণ্যকাজ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। জুমুআর নামাযের পর (আমি) তাদের উভয়ের গায়েবানা জানাযাও পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ মার্চ, ২০২০, পৃঃ ৫-৯)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)